১৪

স্থান -- কলিকাতা, বলরামবাবুর বাটী
কাল -- মার্চ (?) ১৮৯৮

স্বামীজী আজ দুই দিন যাবৎ বাগবাজারে বলরাম বসুর বাটীতে অবস্থান করিতেছেন। শিষ্যের সুতরাং বিশেষ সুবিধা -- প্রত্যহ তথায় যাতায়াত করে। অদ্য সন্ধ্যার কিছু পূর্বে স্বামীজী ঐ বাটীর ছাদে বেড়াইতেছেন। শিষ্য ও অন্য চার-পাঁচ জন লোক সঙ্গে আছে। বড় গরম পড়িয়াছে। স্বামীজীর খোলা গা। ধীরে ধীরে দক্ষিণে হাওয়া দিতেছে। বেড়াইতে বেড়াইতে স্বামীজী গুরুগোবিন্দের কথা পাড়িয়া তাঁহার ত্যাগ তপস্যা তিতিক্ষা ও প্রাণপাতী পরিশ্রমের ফলে শিখজাতির কিরূপে পুনরভুত্থান হইয়াছিল, কিরূপে তিনি মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তিগণকে পর্যন্ত দীক্ষা দান করিয়া পুনরায় হিন্দু করিয়া শিখজাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন, এবং কিরূপেই বা তিনি নর্মদাতীরে মানবলীলা সংবরণ করেন, ওজস্বিনী ভাষায় সেসকল বিষয়ের কিছু কিছু বর্ণনা করিতে লাগিলেন। গুরুগোবিন্দের নিকট দীক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে তখন যে কি মহাশক্তি সঞ্চারিত হইত, তাহার উল্লেখ করিয়া স্বামীজী শিখজাতির মধ্যে প্রচলিত একটি দোঁহা আবৃত্তি করিলেন:

সওয়া লাখ পর এক চড়াউঁ।
যব গুরু গোবিন্দ্ নাম শুনাউঁ।।

অর্থাৎ গুরুগোবিন্দের নিকট নাম (দীক্ষামন্ত্র) শুনিয়া এক ব্যক্তিতে সওয়া লক্ষ অপেক্ষাও আধিক লোকের শক্তি সঞ্চারিত হইত। গুরুগোবিন্দের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিলে তাঁহার শক্তিতে জীবনে যথার্থ ধর্মপ্রাণতা উপস্থিত হইয়া তাঁহার প্রত্যেক শিষ্যের অন্তর এমন অদ্ভুত বীরত্বে পূর্ণ হইত যে, সে তখন সওয়া লক্ষ বিধর্মীকে পরাজিত করিতে সমর্থ হইত। ধর্মমহিমাসূচক ঐ কথাগুলি বলিতে বলিতে স্বামীজীর উৎসাহ-বিস্ফারিত নয়নে যেন তেজ ফুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। শ্রোতৃবৃন্দ স্তব্ধ হইয়া স্বামীজীর মুখপানে চাহিয়া উহাই দেখিতে লাগিল। কি অদ্ভুত উৎসাহ ও শক্তিই স্বামীজীর ভিতরে ছিল! যখন যে বিষয়ে কথা পড়িতেন, তখন তাহাতে তিনি এমন তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, মনে হইত ঐ বিষয়কেই তিনি বুঝি জগতের অন্য সকল বিষয় অপেক্ষা বড় এবং উহা লাভ করাই মনুষ্যজীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া বিবেচনা করেন।

কিছুক্ষণ পরে শিষ্য বলিল, মহাশয়, ইহা কিন্তু বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার যে, গুরুগোবিন্দ হিন্দু ও মুসলমান উভয়কেই নিজ ধর্মে দিক্ষিত করিয়া একই উদ্দেশ্যে চালিত করিতে পারিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ঐরূপ দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত দেকা যায় না।

স্বামীজী -- Common interest (একপ্রকারের স্বার্থচেষ্টা) না হলে লোক কখনও একতাসূত্রে আবদ্ধ হয় না। সভা সমিতি লেকচার দ্বারা সর্বসাধারণকে কখনও unite (এক) করা যায় না -- যদি তাদের interest (স্বার্থ) না এক হয়। গুরুগোবিন্দ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, তদানীন্তন কালের কি হিন্দু, কি মুসলমান -- সকলেই ঘোর অত্যাচার-অবিচারে রাজ্যে বাস করছে। সুরুগোবিন্দ common interest create (একপ্রকারের স্বার্থচেষ্টার সৃষ্টি) করেননি, কেবল ইতর-সাধারণকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন মাত্র। তাই হিন্দু-মুসলমান সবাই তাঁকে follow (অনুসরণ) করেছিল। তিনি মহা শক্তিসাধক ছিলেন। ভারতের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল।

রাত্রি হইতেছে দেখিয়া স্বামীজী সকলকে সঙ্গে লইয়া দোতলার বৈঠকখানায় নামিয়া আসিলেন। তিনি এখানে উপবেশন করিলে সকলে তাঁহাকে আবার ঘিরিয়া বসিল। এই সময়ে miracle (সিদ্ধাই) সম্বন্ধে কথাবার্তা উঠিল।

স্বামীজী -- সিদ্ধাই বা বিভূতি-শক্তি অতি সামান্য মনঃসংযমেই লাভ করা যায়। (শিষ্যকে উপলক্ষ করিয়া) তুই thought-reading (অপরের মনের কথা ঠিক ঠিক বলা) শিখবি? চার-পাঁচ দিনেই তোকে ঐ বিদ্যাটা শিখিয়ে দিতে পারি।

শিষ্য -- তাতে কি উপকার হবে?

স্বামীজী -- কেন? পরের মনের ভাব জানতে পারবি।

শিষ্য -- তাতে ব্রহ্মবিদ্যালাভের কিছু সহায়তা হবে কি?

স্বামীজী -- কিছুমাত্র নয়।

শিষ্য -- তবে আমার ঐ বিদ্যা শিখিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু মহাশয়, আপনি স্বয়ং সিদ্ধাই সম্বন্ধে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বা দেখিয়াছেন, তাহা শুনিতে ইচ্ছা হয়।

স্বামীজী -- আমি একবার হিমালয়ে ভ্রমণ করিতে করিতে কোন পাহাড়ী গ্রামে এক রাত্রের জন্য বাস করেছিলাম। সন্ধ্যার খানিক বাদে ঐ গাঁয়ে মাদলের খুব বাজনা শুনতে পেয়ে বাড়িওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলুম -- গ্রামের কোন লোকের উপর 'দেবতার ভর' হয়েছে। বাড়িওয়ালার আগ্রহাতিশয্যে এবং নিজের curiosity (কৌতুহল) চরিতার্থ করবার জন্য ব্যাপারখানা দেখতে যাওয়া গেল। গিয়ে দেখি, বহু লোকের সমাবেশ। লম্বা ঝাঁকড়া চুলো একটা পাহাড়ীকে দেখিয়া বললে, এরই উপর 'দেবতার ভর' হয়েছে। দেখলুম, তার কাছেই একখানি কুঠার আগুনে পোড়াতে দেওয়া হয়েছে। খানিক বাদে দেখি, অগ্নিবর্ণ কুঠারখানা ঐ উপদেবতাবিষ্ট লোকটার দেহে স্থানে স্থানে লাগিয়ে ছ্যাঁকা দেওয়া হচ্ছে, চুলেও লাগানো হচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ঐ কুঠারস্পর্শে তার কোন অঙ্গ বা চুল দগ্ধ হচ্ছে না বা তার মুখে কোন কষ্টের চিহ্ন প্রকাশ পাচ্ছে না! দেখে অবাক হয়ে গেলুম। ইতোমধ্যে গাঁয়ের মোড়ল করজোড়ে আমার কাছে এসে বলল, মহারাজ, আপনি দয়া করে এর ভূতাবেশ ছাড়িয়া দিন। আমি তো ভেবে অস্থির! কি করি, সকলের অনুরোধে এ উপদেবতাবিষ্ট লোকটার কাছে যেতে হল। গিয়েই কিন্তু আগে কুঠারখানা পরীক্ষা করতে ইচ্ছা হল। যাই হাত দিয়ে ধরা, হাত পুড়ে গেল। তখন কুঠারটা তবু কালো হয়ে গেছে। হাতের জ্বালায় তো অস্থির। থিওরি-মিওরি তখন সব লোপ পেয়ে গেল। কি করি, জ্বালায় অস্থির হয়েও এ লোকটার মাথায় হাত দিয়ে খানিকটা জপ করলুম। আশ্চর্যের বিষয়, এরূপ করার দশ-বার মিনিটের মধ্যেই লোকটা সুস্থ হয়ে গেল। তখন গাঁয়ের লোকের আমার উপর ভক্তি দেখে কে! আমায় একটা কেষ্ট-বিষ্টু ঠাওরালে। আমি কিন্তু ব্যাপারখানা কিছু বুঝতে পারলুম না। অগত্যা বিনা বাক্যব্যয়ে আশ্রয়দাতার সঙ্গে তার কুটিরে ফিরে এলুম। তখন রাত ১২টা হবে। এসে শুয়ে পড়লুম। কিন্তু হাতের জ্বালায়, এই ব্যাপারে কিছুমাত্র রহস্যভেদ করতে পারলুম না বলে চিন্তায় ঘুম হল না। জ্বলন্ত কুঠারে মানুষের শরীর দগ্ধ হল না দেখে কেবল মনে হতে লাগল, 'There are more things in heaven and earth ... than are dreamt of in your philosophy!'[1]

শিষ্য -- পরে ঐ বিষয়ে কোন সুমীমাংসা করিতে পারিয়াছিলেন কি?

স্বামীজী -- না। আজ কথায় কথায় ঘটনাটি মনে পড়ে গেল। তাই তোদের বললুম। অনন্তর স্বামীজী পুনরায়

---

[1] Hamlet -- Shakespeare স্বর্গে ও পৃথিবীতে এমন অনেক ব্যাপার আছে, দর্শনশাস্ত্রে যা কল্পনা করা যায় না।

বলিতে লাগিলেন:

ঠাকুর কিন্তু সিদ্ধাই-এর বড় নিন্দা করতেন; বলতেন, 'ঐ-সকল শক্তি-প্রকাশের দিকে মন দিলে পরমার্থ-তত্ত্বে পৌঁছন যায় না।' কিন্তু মানুষের এমনি দুর্বল মন, গৃহস্থের তো কথাই নেই, সাধুদের মধ্যেও চৌদ্দ আনা লোক সিদ্ধাই-এর উপাসক হয়ে পড়ে। পাশ্চাত্য দেশে ঐ প্রকার বুজরুকি দেখলে লোকে অবাক হয়ে যায়। সিদ্ধাই-লাভটা যে একটা খারাপ জিনিস, ধর্মপথের অন্তরায়, এ কথা ঠাকুর কৃপা করে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন, তাই বুঝতে পেরেছি। সে-জন্য দেখিসনি -- ঠাকুরের সন্তানেরা কেউই ঐ দিকে খেয়াল রাখে না?

স্বামী যোগানন্দ এই সময়ে স্বামীজীকে বলিলেন, তোমার সঙ্গে মাদ্রাজে যে একটা ভূতুড়ে দেখা হয়েছিল, সেই কথাটা বাঙালকে বলো না।

শিষ্য ঐ বিষয় ইতঃপূর্বে শুনে নাই, শুনিবার জন্য জেদ করিয়া বসিলে অগত্যা স্বামীজী ঐ কথা এইরূপে বলিলেন:

মাদ্রাজে যখন মন্মথবাবুর[২] বাড়িতে ছিলুম, তখন একদিন স্বপ্ন দেখলুম -- মা[৩] মারা গেছেন! মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল। তখন মঠেও বড় একটা চিঠিপত্র লিখতুম না -- তা বাড়িতে লেখা তো দূরের কথা। মন্মথবাবুকে স্বপ্নের কথা বলায় তিনি তখনই ঐ বিষয়ের সংবাদের জন্য কলকাতায় 'তার' করলেন। কারণ স্বপ্নটা দেখে মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আবার এদিকে মাদ্রাজের বন্ধুগণ তখন আমার আমেরিকায় যাবার যোগাড় করে তাড়া লাগাচ্ছিল; কিন্তু মায়ের শারীরিক কুশল সংবাদটা না পেয়ে যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। আমার ভাব বুঝে মন্মথবাবু বললেন যে, শহরের কিছু দূরে একজন পিশাচসিদ্ধ লোক বাস করে, সে জীবের শুভাশুভ ভূত-ভবিষ্যৎ সব খবর বলে দিতে পারে। মন্মথবাবুর অনুরোধে ও নিজের মানসিক উদ্বেগ দূর করতে তার নিকট যেতে রাজি হলুম। মন্মথবাবু, আমি, আলাসিঙ্গা ও আর একজন খানিকটা রেলে করে, পরে পায়ে হেঁটে সেখানে তো গেলুম। গিয়ে দেখি শ্মশানের পাশে বিকটাকার, শুঁটকো, ভূষ-কালো একটা লোক বলে আছে। তার অনুচরগণ 'কিড়িং মিড়িং' করে মাদ্রাজী ভাষায় বুঝিয়ে দিলে -- উনিই পিশাচসিদ্ধ পুরুষ। প্রথমটা সে তো আমাদের আমলেই আনলে না। তারপর যখন আমারা ফেরবার উদ্যোগ করছি, তখন আমাদের দাঁড়াবার জন্য অনুরোধ করলে। সঙ্গী আলাসিঙ্গাই দোভাষীর কাজ করছিল; আমাদের দাঁড়াবার কথা বললে। তারপর একটা পেনসিল দিয়ে লোকটা খানিকক্ষণ ধরে কি আঁক পাড়তে লাগল। পরে দেখলুম, লোকটা concentration (মন একাগ্র) করে যেন একেবারে স্থির হয়ে পড়ল। তারপর প্রথমে আমার নাম গোত্র চৌদ্দপুরুষের খবর বললে; আর বললে যে, ঠাকুর আমার সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত ফিরছেন! মায়ের মঙ্গল-সমাচারও বললে! ধর্মপ্রচার করতে আমাকে যে বহুদূরে অতি শীঘ্র যেতে হবে, তাও বলে দিলে! এইরূপে মায়ের মঙ্গল-সংবাদ পেয়ে ভট্টাচার্যের সঙ্গে শহরে ফিরে এলুম। এসে কলকাতার তারেও মায়ের মঙ্গল-সংবাদ পেলুম।

যোগানন্দ স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজী বলিলেন:

ব্যাটা কিন্তু যা যা বলেছিল, ঠিক তাই তাই হয়ে গেল; তা সেটা 'কাকতালীয়ের' ন্যায়ই হোক বা যাই হোক।

যোগানন্দ -- তুমি পূর্বে এ-সব কিছু বিশ্বাস করতে না, তাই তোমার ঐ-সকল দেখবার প্রয়োজন হয়েছিল।

---

[২] মহেন্দ্রচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র মন্মথনাথ ভট্টাচার্য মাদ্রাজে একাউন্টেন্ট জেনারেল ছিলেন।

[৩] স্বামীজীর গর্ভধারিণী

স্বামীজী -- আমি কি না দেখে, না শুনে যা তা কতকগুলো বিশ্বাস করি? এমন ছেলেই নই। মহামায়ার রাজ্যে এসে জগৎ-ভেলকির সঙ্গে সঙ্গে কত কি ভেলকিই না দেখলুম। মায়া -- মায়া!! রাম রাম! আজ কি ছাইভস্ম কথাই সব হল। ভূত ভাবতে ভাবতে লোকে ভূত হয়ে যায়। আর যে দিনরাত জানতে-অজানতে বলে, 'আমি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মা', সেই ব্রহ্মজ্ঞ হয়।

এই বলিয়া স্বামীজী স্নেহভরে শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন:

এই-সব ছাইভস্ম কথাগুলোকে মনে কিছুমাত্র স্থান দিবিনি। কেবল সদসৎ বিচার করবি -- আত্মাকে প্রত্যক্ষ করতে প্রাণপণ যত্ন করবি। আত্মজ্ঞানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নেই। আর সবই মায়া -- ভেলকিবাজি! এক প্রত্যগাত্মাই অবিতথ সত্য -- এ কথাটা বুঝেছি; সে জন্যই তোদের বোঝাবার চেষ্টা করছি। 'একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন'।

কথা বলিতে বলিতে রাত্রি ১১টা বাজিয়া গেল। অনন্তর স্বামীজী আহারান্তে বিশ্রাম করিতে গেলেন। শিষ্য স্বামীজীর পাদপদ্মে পরণত হইয়া বিদায় গ্রহণ করিল। স্বামীজী বলিলেন, কাল আসবি তো?

শিষ্য -- আজ্ঞে আসিব বইকি। আপনাকে দিনান্তে না দেখিলে প্রাণ ব্যাকুল হইয়া ছটফট করিতে থাকে।

স্বামীজী -- তবে এখন আয়, রাত্রি হয়েছে।